বিমূর্ত (Abstract)

বাংলা ভাষার ‘ইসলামি প্রাইমার’ : বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার আলোকে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ (১৯৯০ – ২০২০)

সূচক শব্দ : বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা – মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা – ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা - ধর্মীয় শিক্ষা – পাঠ পাঠক্রম – প্রাইমার – ইসলামি প্রাইমার – দীক্ষিতকরণ – অভিভাবন

বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা কার্যত দুটিই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও এই দুইয়ের মধ্যেই নিহিত আছে ভিন্ন ধারার শিক্ষা আদর্শ। ‘মাদ্রাসা’ শব্দের মধ্যে আক্ষরিক অর্থে ধর্মের কোনো যোগ না থাকলেও কালে কালে ‘মাদ্রাসা’ আসলে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই নিজেকে রূপান্তরিত করে নিয়েছে। মাদ্রাসার এই রূপ বদলের ইতিবৃত্ত আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে অনেকের আলোচনায় দেখেছি যে, তাঁরা মাদ্রাসাকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দেখতে চান এবং বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সমান্তরালে তার সচলতার গৌরব প্রকাশ করেন। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক ধরণের পক্ষপাতিত্ব ও অর্ধসত্য মানসিকতা আছে। গুটিকয়েক সরকারি মাদ্রাসা বাদে রাজ্য তথা বিশ্বের অধিকাংশ মাদ্রাসাই ধর্মের দ্বারা চালিত। এমনকি সরকারি অনুমোদন ও অনুদানের বাইরে থাকা এই সুবৃহৎ মাদ্রাসা শিক্ষা বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থাকে তার প্রতিস্পর্ধী হিসেবেই দেখে এবং তাকে সমালোচিত করে, তার অবমূল্যায়ন করে, তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে চায়। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক অবস্থানে বিরাজ করছে – মাদ্রাসা; ধর্ম ও ইসলামি ঐতিহ্য নির্ভর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ব্যতিক্রম আছে, যা বিরলতায় দুর্লক্ষ্য) এবং বিদ্যালয়; ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এই দুই বর্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে কখনোই একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তার দ্বারা চালিত হয়নি। শাসকের বা রাষ্ট্র পরিচালকদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই শ্রেণির প্রতিষ্ঠানেই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির অদল বদল লক্ষ করা গেছে। এই পাঠক্রম নিয়ন্ত্রণের পেছনে নিহিত থাকে রাষ্ট্রশক্তির স্বার্থ। এ প্রসঙ্গে গ্রামশি মনে করেন যে কোনো শ্রেণি ক্ষমতা লাভ করতে কোনো না কোনো ভাবে জোর খাটায়, জোর খাটিয়ে সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। এই যে ক্ষমতা যা জোর বা শক্তিরই দান, গ্রামশি তাকেই বলেন ‘প্রধান্য’। কিন্তু এই প্রাধান্যকে যদি যথার্থই প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে তার পত্তনের আগেই এবং পত্তনের অব্যবহিত পরেও

চালিয়ে যেতে হবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। অর্থাৎ সমগ্র জনসমাজের মধ্যে ঐ শ্রেণির ভাবাদর্শ তথা মূল্যবোধ তথা সামগ্রিক চিন্তাপদ্ধতি সর্বস্তরে প্রোথিত করে দিতে হবে। আর ভাবাদর্শ তথা মূল্যবোধ এক স্তর থেকে আরেক স্তরে পৌঁছে দেবার সহজ পথ হলো শিক্ষা। শিক্ষার দ্বারাই তৈরি হয় বিশ্বাসের জমি। কিন্তু এই বিশ্বাসের জমি গড়ে তোলবার জন্য প্রয়োজন দীক্ষিতকরণ ও অভিভাবন। ইংরেজিতে যাকে বলে 'Indoctrination' আমরা তার বাংলা তর্জমা করেছি 'দীক্ষিতকরণ' এবং 'Suggestion' এর বাংলা হিসেবে গ্রহণ করেছি 'অভিভাবন' শব্দ দুটিকে।

কোনো মতের অনুগামিতা করা, সেই মতবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বিশদর্থে সেই বিশ্বাসের নিরিখে জীবন ধারণই হল দীক্ষিতকরণ। অনুরূপভাবে 'অভিভাবন' মনোবিজ্ঞান থেকে এসেছে, যার সরল অর্থ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনে নির্দিষ্ট ধারণা অনুপ্রবিষ্ট করানো। অভিভাবন মানুষের শিক্ষা, মত, আচার, রুচি এককথায় সামগ্রিক ধ্যান ধারণাকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ দীক্ষিতকরণ হলো কোনো মত বা তত্ত্বে বিশ্বাস, অভিভাবন সেই বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে কাজ করা। দীক্ষিতকরণ > অভিভাবন দুটিই টিকে থাকার ও ক্ষমতাতন্ত্রের পথকে প্রশস্ত করবার রসদ যোগায়। সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন জনসমষ্টি অভিভাবিত হতে পারে দুইভাবে –

ক. সামূহিক অভিভাবন

খ. ব্যক্তিগত বা স্ব-অভিভাবন।

হিটলারের বক্তৃতায় জার্মানের বৃহদংশের মানুষ অভিভাবিত হয়েছিল, যে ইহুদিরা প্রকৃতই জাতীয় নিরাপত্তার বাধা। আবার স্বাভিভাবনের দৃষ্টান্ত হলো আমরা কঠিন কাজে প্রথমে ভয় পেলাম কিন্তু পরক্ষণেই নিজেদেরকে বোঝালাম যে, আমাদের মধ্যে যথেষ্ট কর্মক্ষমতা এবং বুদ্ধি আছে, অতঃপর ভয় চলে গেলো এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো। দীক্ষিতকরণ – অভিভাবনের এই দুই রূপ, সামূহিক ও ব্যক্তিক, তাদের সময়কালের বিচারে আবার দুভাবে দেখা দেয়। যথা – ক. সাময়িক খ. দীর্ঘস্থায়ী। সাময়িক দীক্ষিতকরণের উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি টেলিভিশনের পর্দায় বুদ্ধিজীবী কিংবা রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য শুনে আমরা এতটাই অভিভাবিত হলাম যে, তাঁর পক্ষে নির্বাচনে ভোট প্রদান করলাম। আর দীর্ঘস্থায়ী দীক্ষিতকরণের উদাহরণ হলো আমাদের মনের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকা নানাবিধ প্রথা, আচার অথবা সংস্কার। এই ধরণের সংস্কার বা প্রথা আমাদের মনের মধ্যে এতটাই স্থায়ী আসন লাভ করে থাকে যে, কখনো সেই সংস্কার বা প্রথার দ্বারা মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হলেও আমরা সেই সংস্কার কিংবা লোকাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারিনা, পরিবর্তে তার সমর্থনে এমনকি তাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকি।

এই দীক্ষিতকরণ ও অভিভাবন নানাভাবে কাজ করে। বিশেষত ক্ষমতাতন্ত্র নিজেকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই দীক্ষিতকরণ-অভিভাবনের তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ দ্বন্দ্বটা ক্ষমতার। আর ক্ষমতাকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকবার জন্য শক্তি সংগ্রহ করে যেমন ক্ষমতাসীনকে মোকাবিলা করা যায়, তেমনই দুর্বলকে টিকে থাকতে হয় ক্ষমতাসীনের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে। এখন শক্তি সংগ্রহ এবং আধিপত্য স্বীকার করানো - এই দুটি ক্ষেত্রেই দীক্ষিতকরণ ও অভিভাবন চমৎকার কাজ করে। 'জেহাদ' এবং 'জামায়াত' এর নামে দীক্ষিতকরণ করে অসংখ্য মুসলমানকে সংগঠিত করা যায় এবং শক্তি সংগ্রহ করা যায়। আবার 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' অর্থাৎ মানুষের অধিকার শুধু কর্মে, কর্মফলে নয় – এইসব শাস্ত্রবাক্য দীক্ষিতকরণের মধ্যে দিয়ে অতি সহজে এক শ্রেণির মানুষেকে শ্রমের মূল্য থেকে বঞ্চিত করে ক্ষমতাসীনের আধিপত্য বজায় রাখা যেতে পারে।

লক্ষ করবার বিষয় শক্তিমান ও ত্রাসসৃষ্টিকারী ক্ষমতাসীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে, এতকালের যারা নিপীড়িত, দলিত তাদের বাড়তি সাহস লাগে, দরকার হয় বাড়তি মনোবলের। দীক্ষিতকরণ > অভিভাবন সেই মনোবল ও শক্তি যোগায়। তেমনই অন্যায়কে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে দৈনন্দিন নিষ্পেষণ, নিপীড়নের গ্লানিকেও অতিক্রম করতে দরকার হয় অভিভাবনের। তাই শাসক সর্বদাই আপন স্বার্থে অভিভাবনকে প্রয়োগ করে থাকেন।

উপরিউক্ত এই দীক্ষিতকরণ এবং অভিভাবন তত্ত্বের উপরেই কি টিকে নেই আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা? তা নইলে শাসকের বদল হলেই কেন বদলে যায় পাঠক্রম নিদেনপক্ষে পাঠ্যসূচি? অথবা বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতিস্পর্ধী অবস্থানে কেন বেড়ে ওঠে টোল কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষা? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন, যে শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করে ও সক্রিয় করে, আমাদের মনকে অবুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে সেই শিক্ষার দ্বারাই আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটাতে। কিন্তু দেশে দেশে কালে কালে শাসকের হাতে তাঁর মর্জি মাফিক নব নব অবয়ব লাভ করেছে শিক্ষা। কখনো তা বুদ্ধিকে মুক্ত করেছে কখনো বা বুদ্ধিকে চালিত করেছে শাসকের অধীনে। আর সেই শিক্ষার অনুকূলে রচিত হয়েছে পাঠ্যপুস্তক – তা শিশুশিক্ষা থেকে শুরু করে বয়স্ক শিক্ষা পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

বর্তমান গবেষণায় আমাদের আলোচনা নির্দিষ্ট করা হয়েছে প্রাইমার অর্থাৎ শিশুপাঠ্যপুস্তকের উদ্ভব বিকাশ, শ্রেণিকরণ ও তার সমাজতাত্ত্বিক ভাষ্য নিয়ে। আমরা জানি শৈশবে শিশু পাঠকের

মস্তিষ্কে যে সমস্ত চিন্তা ভাবনা দীক্ষিত ও অভিভাবিত করা হবে তা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকবে। তাই প্রতিটি দেশেই শৈশব থেকেই চলে মগজ মেরামতের প্রস্তুতি। প্রাইমারগুলি আসলে মগজ মেরামতের হাতিয়ার। এগুলির হাত মধ্যে দিয়েই শিশু পাঠকের মস্তিষ্ককে দখল করবার জন্য শুরু হয় অভিভাবন ও দীক্ষিতকরণ। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দুটি ভিন্ন পথে এই দীক্ষিতকরণ ও অভিভাবনের আয়োজন করে থাকে। আমাদের আলোচ্য প্রাইমারগুলিতে এই ভিন্ন পথের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে চাওয়া হয়েছে এবং তাদের সমাজ-প্রগতিমূলক মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান আলোচনায় আমরা বিদ্যালয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার আলোকে বাংলা ভাষায় রচিত 'ইসলামি প্রাইমারের' মূল্যায়ন করেছি। যেহেতু বিদ্যালয় শিক্ষাকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা ধর্মীয় শিক্ষার অঙ্গন হিসেবে চিহ্নিত করেছি তাই বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রচলিত প্রাইমারের প্রতিস্পর্ধী হিসেবেই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাইমারগুলিকে বিচার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রচলিত প্রতিনিধি স্থানীয় প্রাইমারগুলির সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রচলিত নির্বাচিত প্রাইমারগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।